

হিন্দু
থেকে
মিজদা

সিঁদুর থেকে সিঁজদা

তাহিয়াতুল জান্নাত

সম্পাদনায়

মাহিন মাহমুদ

কৃতজ্ঞতায়

জিয়াউল আশরাফ

মাসুদুর রহমান



IFFAH
PUBLICATIONS

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই তানজিম ইসলাম শিশির,
আমার প্রিয় জীবনসঙ্গী শিহাব সজিব
যাঁরা আমাকে সাহস দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন
এবং আমার পথচলাকে সহজ করেছেন।

তাদের ভালোবাসা, দোয়া ও অনুপ্রেরণার প্রতি-
এই ক্ষুদ্র নিবেদন।

আল্লাহ তাদের নেক হায়াত দান করুন,
স্বস্থতা, শান্তি ও বরকতে রাখুন এবং উত্তম প্রতিদান দান
করুন।



সম্পাদকের টুকরো আলাপ

‘সিঁদুর থেকে সিজদা’ নামটাই একটা গল্প বলে দেয়।

এটি শুধু একটি উপন্যাস নয়, এটি একটি অন্তর্জার্নি। পরিচয়, বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণের গল্প।

আমরা সবাই জীবনের কোনো না কোনো বাঁকে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিই। কারো সিদ্ধান্তের নাম হয় “সিঁদুর”, কারো হয় “সিজদা”।

লেখিকা অত্যন্ত সচেতনতার সাথে এমন একটি বিষয়কে তুলে ধরেছেন, যা আমাদের সমাজে উচ্চারিত হয় কম, কিন্তু ভাবায় বেশি।

আশা করি এই বই পাঠকের বিবেককে নাড়া দেবে। এবং মনে করিয়ে দেবে - ফেরার দরজা সবসময় খোলা থাকে।

মাহিন মাহমুদ

লেখক, গবেষক

প্রকাশকের কথা

‘সিঁদুর থেকে সিজদা’—একজন নারীর জীবনের গল্পের আড়ালে মূলত এক অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনের গল্প। ভুল, অনুশোচনা, তাওবা, ঈমান, পর্দা, ভালোবাসা, ত্যাগ ও দ্বীনের পথে নিজেকে সমর্পণের এক অন্তরযাত্রা।

এই বই মনে করিয়ে দেয়—মানুষ যত দূরেই সরে যাক, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার দরজা কখনো বন্ধ হয় না। আর একজন মানুষের পরিবর্তন কখনো শুধু তার নিজের জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তা ছড়িয়ে পড়তে পারে পরিবার, সমাজ এবং অন্য মানুষের জীবনেও।

‘সিঁদুর থেকে সিজদা’ তাই কেবল একটি উপন্যাস নয়; এটি ফিরে আসার, নিজেকে বদলে নেওয়ার এবং আল্লাহর জন্য বাঁচতে শেখার এক কোমল আহ্বান।

— আজমিন আক্তার ইভা

info.iffah@gmail.com

পবা, রাজশাহী

১৪/০৮/২৬

লেখিকার চিঠি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আমি কাউকে আদেশ বা উপদেশ দেওয়ার যোগ্য নই। নিজেকেও কোনো আমলদার মানুষ বলে দাবি করি না। চাইলেই হয়তো প্রেম-ভালোবাসার গল্প লিখতে পারতাম, কিন্তু কারও গুনাহের উসিলা হতে চাইনি। কারণ কিছু লেখা মানুষকে যতটা ভাবায়, কখনো কখনো ততটাই সেই পথে আকৃষ্টও করে।

আমার লেখাগুলো মনের গভীরে জন্মে থাকা কিছু অনুভূতি, ভাবনা ও কল্পনাকে শব্দে ফুটিয়ে তোলার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। এর অর্থ এই নয় যে আমি অনেক আমল করি কিংবা গুনাহমুক্ত কোনো মানুষ। বরং জেনে-না-জেনে আমিও প্রতিনিয়ত কত ভুল-ত্রুটি ও গুনাহে জড়িয়ে পড়ি—তার হিসাব একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

লেখা আমার শখ, আমার অনুভূতি প্রকাশের একটি ছোট মাধ্যম মাত্র। তবুও হৃদয়ের গভীরে একটিই চাওয়া—আমার কোনো লেখার মাধ্যমে যদি কেউ সামান্য ভালো কিছু শিখতে পারে, যদি কারও হৃদয়ে ভালো পথে ফিরে আসার ক্ষীণ ইচ্ছেটুকুও জন্ম নেয়, তবে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

কারণ অন্যকে ভালো পথে ডাকার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার আড়ালে, আমিও আসলে নিজেকেই বারবার ভালো পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। হয়তো কাউকে কিছু মনে করিয়ে দিতে গিয়ে নিজেরই ভুলগুলো চোখে পড়ে,

১০ ♦ সিঁদুর থেকে সিজদা

কাউকে ভালো হওয়ার কথা বলতে গিয়ে নিজেকেই ভালো হওয়ার তাগিদ অনুভব করি।

আল্লাহ যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, আমার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করেন এবং আমাকে সর্বদা সত্য ও সুন্দর পথের ওপর অটল রাখেন।

ইতি

এক নগণ্য গুনাহগার বান্দী—

তাহিয়াতুল জান্নাত



১

-এই যে, রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ান!

পেছনে কারো কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল আশফি। প্রিয় বান্ধবী মায়া আর আফিয়াকে বিদায় দিয়ে কখন যে সে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে খেয়ালই করেনি। পেছনে তাকাতেই দেখল পায়ের কাছে একটা বাইক দাঁড়িয়ে আছে, আর বাইকে থাকা লোকটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আশফির দিকে তাকিয়ে আছে। আশফি বলল,

দুঃখিত, লক্ষ করিনি।

করবেন কীভাবে? আপাদমস্তক যেভাবে কালো কাপড়ে ঢেকে আছেন, লক্ষ না করারই তো কথা।...হাঁটতে না পারলে এসব অদ্ভুত পোশাক পরেন কেন, হ্যাঁ? এখন যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো, তাহলে তো আমারই দোষ হতো। ভাবতেই অবাক লাগে এই আধুনিক যুগে এসেও আপনারা কীসব অদ্ভুত কাপড়-চোপড় পরেন!'

প্রধান সড়ক। তার ওপর কলেজের সামনে। লোকটার চেঁচামেচি শুনে এরই মধ্যে মানুষজন জড়ো হয়ে গেছে। আশফির ইচ্ছে করছে লোকটাকে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে। কিন্তু যেহেতু এখানে আশফিরই ভুল, তাই আশফি আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আশেপাশের লোকগুলোও যেন কেমন! একটা মেয়েকে এমনভাবে অপদস্থ হতে দেখেও কেউ কিছু বলছে না! সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে!

লোকটা একের পর এক নানান কটু কথা বলেই যাচ্ছিল। যখন দেখল আশফি কোনো কথা বলছে না, তখন সে বিরক্ত হয়ে বাইক ঘুরিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, এখন মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। এদের ভালো করেই জানা আছে আমার। ভালো মানুষের মুখোশ পরে এরাই সমাজে বাজে কাজ করে বেড়ায়।

আশফি তবুও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। লোকটার উদ্দেশ্যে শুধু

১২ ♦ সিঁদুর থেকে সিজদা

মনে মনে বলল, আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়েত দান করো!

আশফি বাসায় এসে বোরকা খুলে বিছানায় বসেছে মাত্র, তখনই আহনাফ দৌড়ে এসে আশফিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আন্নি তুমি কখন এসেছো?

এইতো বাবা, এখনই।

চকলেট এনেছো আমার জন্য?

আশফি মৃদু ভৎসনার স্বরে বলল, আমি তোমাকে চকলেট দিব না, তুমি আমার কোনো কথা শোনো না।

কেন আমি কী করেছি?

তোমাকে না বলেছি, প্রথমে কাউকে দেখলে সালাম দিবে, তারপর কথা বলবে!

সরি আন্নি! ভুলে গিয়েছি। এখন দেই, আসসালামু আলাইকুম।

ওয়লাইকুমুস সালাম, তোমাকে যেন কী বলেছিলাম, সালাম দিলে কী হয়?

সালাম দিলে নব্বইটি নেকি পাওয়া যায়, আর উত্তর দিলে দশ নেকি।

মাশাআল্লাহ, গুড বয়। এখন থেকে মনে থাকবে তো?

জি, ইনশাআল্লাহ মনে থাকবে।

এই নাও, একদিনে একটির বেশি খাবে না।

ওকে, থ্যাংক ইউ!

আহনাফ হলো আশফির বড় ভাইয়ের একমাত্র ছেলে। বয়স চার পেরিয়ে পাঁচে পড়েছে। খুবই দুষ্ট ছেলে। আশফিকে আন্নি বলে ডাকে, আশফিও তাকে অসম্ভব আদর করে।

মূলত আশফিরা তিন ভাইবোন। বড় ভাই আদনান, যে সৌদি প্রবাসী।

ছোটবোন আয়রা, এবার এসএসসি পাস করেছে। আর মেজো আশফি। বয়স আঠারো থেকে উনিশে পড়েছে।

আদনান বিদেশে থাকায় সংসারটা আশফিকে দেখাশোনা করতে হয়। আদনানের স্ত্রী মাহিয়া খুবই নরম ও শান্ত প্রকৃতির। সে ঘরের দিকটা সামলালেও বাইরের সব কাজই আশফিকে করতে হয়।

ছোটবোন আয়রা আশফিকে দেখে সালাম দিয়ে বলল,

কখন আসলি আপু?

এইতো আধঘন্টা হলো।

খেতে আয়, খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

আশফি বলল, খাওয়া-দাওয়া পরে। শোন, তোর সাথে জরুরি কথা আছে।

কী কথা?

বলছি, দাঁড়া।

এখন না, প্লিজ! আগে খেয়ে নিই চল।

আশফি মুচকি হেসে বলল, আচ্ছা, চল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আশফির ভাবি মাহিয়া, আহনাফকে নিয়ে রুমে চলে গেল। খাবারের রুমে আর কেউ নেই। আয়রা বলল, এখন বল, কী বলতে চেয়েছিলি?

আশফি বলল, তার আগে বল, আগবাড়িয়ে তুই ভাইয়াকে কিছু বলবি না!

আচ্ছা ঠিক আছে, বলবো না।

হয়েছে, তুই যে কেমন তা আর আমাকে বলতে হবে না। ঠোঁট পাতলা মেয়ে একটা।

আয়রা কপট অভিমান দেখিয়ে বলল, আপু একদম অপমান করবি না।

আশফি হেসে বলল, মোটেও অপমান করছি না, তুই তো এমনই।

বলেছে। আমি মোটেও চোঁট পাতলা না। আচ্ছা, এখন কী বলবি বল।
আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

আমি ঠিক করেছি, আগামী মাস থেকে দেবীকে পড়াবো।

আয়রা কিছুটা অবাক হয়ে বলল, কী বলিস আপু, সেদিনও তো
গীতারানীকে না করে দিলি! এখন তাহলে কী মনে করে তার মেয়েকে
পড়াতে চাস?

আশফি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাবা-মা আমার কারণেই দুনিয়া ছেড়ে
বিদায় নিয়েছেন। বেঁচে থাকতে তো তাদের কোনো ইচ্ছা পূরণ করতে
পারিনি। মৃত্যুর পর অন্তত তাদের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করি! তাঁরা সব সময়
চেয়েছেন, আমি যেন মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিই। ...তাই আমি
এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আয়রা ছলছল চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল,
আপু, সবসময় নিজেকে দোষ দিস কেন বল তো? ঐ ঘটনায় তো তোর
কোনো দোষ ছিল না। ওরা আমাদের উপর জুলুম করেছে। ওরা দুনিয়াতে
শাস্তি না পাক আখেরাতে তো পাবেই। আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না।
দুই বছর অতিবাহিত হলো বাবা-মা আল্লাহর কাছে চলে গেছেন, অথচ তুই
এখনো নিজেকে দোষ দিয়ে যাচ্ছিস!

আশফি বিষণ্ণ গলায় বলল, এসব কথা এখন থাক। আমি শুনেছি,
দেবী মেয়েটা খুবই ভালো এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহী। তাই ভাবছি
আগামী মাস থেকেই দেবীকে পড়ানো শুরু করব। এবং পড়ানোর ফাঁকে
ফাঁকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকব। আল্লাহ চাইলে ওদের জীবন আমার
উসিলায় বদলে যেতেও পারে। আর সব থেকে বড় কথা, ওদের বাড়িতে
কোনো পুরুষলোক নেই। ওর বাবা রাজেশ দাস ব্যবসায়ের কাজে অধিকাংশ
সময় বিদেশে থাকেন। তাই আমার জন্য সুবিধাই হবে।